International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 224-231
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.215

ভারতীয় ঐতিহ্যে মানবতা ও ধর্ম: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

পার্থসারথি অধিকারী

গবেষক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 01.02.2026; Accepted: 09.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper explores the indigenous evolution of humanism within the Indian philosophical tradition, arguing that it represents a holistic and cosmic worldview distinct from the anthropocentric humanism of the West. By analyzing the trajectory from the Vedic concept of Rita (cosmic order) to the Upanishadic realization of the self (Atman) and the ethical pragmatism of the Mahabharata, the study demonstrates how Indian thought has consistently placed human dignity and universal brotherhood at its core.

The paper examines the multidimensional nature of Dharma, moving beyond ritualistic interpretations to define it as a sustaining force for social harmony (Lokasamgraha) and ethical conduct. Special emphasis is placed on the Mahabharata as a "laboratory of Dharma," analyzing concepts like Apaddharma (situational ethics) and the Yaksha-Yudhishthira dialogue to highlight the prioritization of human values over rigid scriptural rules. This paper asserts that Indian humanism integrates the spiritual with the social, offering a timeless model of universal well-being (Sarvabhutahite Ratah) that remains relevant in the contemporary world.

Keywords: Indian Humanism, Dharma, Mahabharata, Upanishads, Lokasamgraha, Cosmic Ethics, Apaddharma.

বর্তমান বিশ্বের বস্তুবাদী প্রেক্ষাপটে ‘মানবতা’ শব্দটি অনেক সময় একটি আধুনিক পাশ্চাত্য ধারণা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে তাকালে দেখা যায়, এখানে ‘মানবতা’ কোনো বিচ্ছিন্ন মতবাদ নয়, বরং তা ধর্মেরই অন্তঃসার। ভারতীয় ঐতিহ্যে ‘ধর্ম’ কেবল শাস্ত্রীয় আচার বা সংকীর্ণ মতবাদ নয়। ধর্ম হল সেই শাশ্বত সত্য যা মানুষকে ধারণ করে রাখে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে তার একাত্মতা ঘোষণা করে। ঋগ্বেদের সাম্যমন্ত্র থেকে শুরু করে উপনিষদের অদ্বৈত দর্শন, কিংবা মহাভারতের ‘লোকসংগ্রহ’ থেকে আধুনিককালের বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের ‘মানুষের ধর্ম’— সবখানেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে মানবতার জয়গান। ভারতবর্ষের এই পবিত্র ভূমিতে ‘ধর্ম ও মানবতা’কে কখনোই আলাদা করে দেখা হয়নি; বরং মানবসেবাকেই ঈশ্বরসেবার সর্বোত্তম পথ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে ভারতীয় ঐতিহ্যের সেই সুগভীর দর্শনের আলোকেই ‘মানবতা ও ধর্ম’ শব্দ দুটির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের অন্তর্নিহিত দর্শনের একটি পর্যালোচনা করা হবে।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতি এক অখণ্ড ও সামগ্রিক চেতনার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। সেকারণেই, ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষা ও দর্শন চিরকালই সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে একটি সামগ্রিক চেতনার কথা বলেছে। আসল কথা, কে আপন আর কে পর—এই ভেদ ভুলে সমগ্র পৃথিবীকে একটি বিশাল পরিবার

হিসেবে গ্রহণ করাই হল ভারতীয় ঐতিহ্যের আসল পরিচয়। এই পরিচয় প্রকাশ পাই *“বসুধৈব কুটুম্বকম্”* [১] এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। তাই এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, ভারতীয় চিন্তাবিদরা মানবতাবাদের নবদর্শনকে স্বাগত জানিয়ে তাকে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই বিচার ও বিশ্লেষণ করেছিলেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যে ‘মানবতা’ কোন অর্বাচীন বা পরবর্তী সংযোজন নয়; বরং বৈদিক যুগ থেকেই এই মূল্যবোধের শিকড় তার ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে মানবকেন্দ্রিক চিন্তাধারা একটি অবিচ্ছিন্ন স্রোতের মতো। *উপনিষদ*-এর ঋষিরা যখন ঘোষণা করেন—*“পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ”* [২] অর্থাৎ মানুষের চেয়ে শ্রেয় বা গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই; তখন তাঁরা মানুষকেই চরম সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। এই তাত্ত্বিক ভিত্তিই পরবর্তীতে বুদ্ধের করুণার বাণীতে এবং পৌরাণিক যুগের মহাকাব্য *মহাভারত*-এর— *“ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ”* [৩] অর্থাৎ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই; এই শ্লোকে আরও মূর্ত হয়ে ওঠে।

বৈদিক যুগের এই তাত্ত্বিক মানবতাবাদ মধ্যযুগের ভক্তি, সুফি ও বাউল প্রমুখ সাধকদের হাত ধরে একটি সামাজিক ও ব্যবহারিক রূপ লাভ করে, যেখানে মানবসেবাই ঈশ্বরের সেবা হিসেবে গণ্য হয়েছে। এই সময়েই বড়ু চণ্ডীদাস মূর্তিপূজা বা আচার-সর্বস্বতার ঊর্ধ্বে উঠে গাইলেন—“সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।”[৪] বাউল সাধক লালন ফকির জাত-পাতের বেড়া ভেঙে শেখালেন যে, ঈশ্বর কোনো মন্দিরে বাস করেন না, মানুষের হৃদয়েই তাঁর স্থান (আরশিনগর)[৫]।

মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের এই ধারাটিই কালের পরিক্রমায় আধুনিক ভারতীয় নবজাগরণের ভিত্তিভূমি রচনা করে। ভারতীয় ইতিহাসের আধুনিক পর্বে রাজা রামমোহন রায় ধর্মীয় ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এই পুনর্জাগরণের পুরোধা বা জনক ছিলেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য কিংবদন্তি ব্যক্তিত্বরা এই ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। পরবর্তীতে, বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন ভারতীয় মনীষী—যেমন ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা মহাত্মা গান্ধী—তাঁরা সকলেই রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় ধর্মের মহান ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের জন্যও কাজ করেছিলেন। অদম্য বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভর উৎসাহের সাথে তাঁরা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছিলেন যে, প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান এবং তার ঐতিহ্য সামগ্রিকভাবে মানবতার বিষয়ে পশ্চিমী ঐতিহ্যের চেয়েও অধিকপ্রাচীন এবং অধিকতর সমৃদ্ধ।

বৈদিক সাহিত্যে ধর্মের শিকড় খুঁজে পাওয়া যায় *‘ঋত’*-এর ধারণার মধ্যে। অথর্ববেদ ঘোষণা করে যে মহাবিশ্ব ধর্মের দ্বারা ধৃত (সুরক্ষিত)— *“পৃথিবীং ধর্মেণা ধৃতাম্।”*[৬] ঐতরেয় ব্রাহ্মণে *‘ঋত’* সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি সমগ্র বিশ্বে, এমনকি দেবতাদের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত। *‘ঋত’* হল সেই মহাজাগতিক শৃঙ্খলা, যা

---

1 *“অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।”– হিতোপদেশ,* মিত্রলাভ, ১.১৩

2 *মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎপুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥– কঠোপনিষদ*— ১-৩-১১ অতুলচন্দ্র সেন প্রমুখ (অনু. ও সম্পা.), *উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ)* (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০২১), পৃ. ১১০।

3 *“গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং ব্রবীমি । ন মানুষাত্ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিত্।।”— মহাভারতম্* ১২/২৯৯/২০

4 *চণ্ডীদাসের পদাবলী,* শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ৮৫নং পদ, ৩৫১পৃষ্ঠা।

5 *“বাড়ির কাছে আরশিনগর, সেথা এক পড়শি বসত করে।”*— লালন ফকির।

6 *“বিশ্বস্বং মাতরমোষধীনাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণা ধৃতাম্ । শিবাং স্যোনামনু চরেম বিশ্বহা।।”—অথর্ববেদ*-১২/১/১৭

স্থিতিশীলতা বজায় রাখে এবং সত্য ও ন্যায়বিচারের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই *'ঋত'*-ই বিবর্তিত হয়ে পরবর্তীতে ভারতীয় দর্শনের কেন্দ্রীয় ধারণা *'ধর্মে'* প্রকাশিত হয়েছে, যা সমস্ত নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উৎস।

কালের বিবর্তনে সমাজ যখন সংগঠিত হল এবং হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের মতো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল, তখন ধর্মশাস্ত্রের মাধ্যমে আচরণের নিয়মাবলি বিধিবদ্ধ করা শুরু হয়। ধর্মকে তখন পরিস্থিতি ও পর্যায়ভেদে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। যেমন—জরুরি অবস্থার জন্য *'আপদ্ধর্ম'*, বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য *'নৈমিত্তিক ধর্ম'*, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য *'আশ্রম ধর্ম'* এবং জীবনের চারটি মূল লক্ষ্য বা *পুরুষার্থ* হিসেবে 'ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ' নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন সময়ের ঋষিরা বিপুল সংখ্যক *ধর্মশাস্ত্র* ও *গৃহ্যসূত্র* রচনার মাধ্যমে নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান এবং স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলেন।

প্রাচীন ভারতে ধর্মের এই ধারণাটি গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে আরও বিকশিত হয়েছিল। উপনিষদের যুগের ঋষিরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আমি কে এবং বিশ্বের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?' এই অন্বেষণের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাঁরা অন্তর্দৃষ্টির ওপর জোর দেন—*"আত্মানং বিদ্ধি"* বা নিজেকে জানো। ভারতীয় দর্শনে এই অনুসন্ধান *'আত্মা'*-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং পরবর্তীতে তা বেদান্তের সর্বব্যাপী *'ব্রহ্ম'*-এর ধারণায় লীন হয়ে যায়। উপনিষদের মহাবাক্য *'তত্ত্বমসি'* [7] (তুমিই সেই)—আত্মা ও ব্রহ্মের এই একাত্মবোধের কথাই ঘোষণা করে। উপনিষদগুলি যজ্ঞ ও আচারের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে চিন্তার এক বিপ্লব ঘটিয়েছিল, যা ভারতীয় দর্শনের সূতিকাগার হিসেবে গণ্য হয়।

এই দার্শনিক যাত্রা কর্ম, সংসার এবং মোক্ষের ধারণার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায় *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-য়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-য় *"সর্বভূতহিতে রতাঃ"*[8] বা সকল প্রাণীর মঙ্গলে রত থাকাকেই সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-য় ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত মুক্তির উপায় নয়, বরং *'লোকসংগ্রহ'*[9] বা মানবতার কল্যাণের হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সহজ কথায়, *'সর্বভূতহিতে রতাঃ'* হল মনের ভাব (করুণা), আর *'লোকসংগ্রহ'* হল সেই ভাবের বাস্তব প্রয়োগ (নি:স্বার্থ কাজ)। এভাবেই প্রাচীন ভারত থেকে উঠে আসা ধর্মের ধারণা মহাজাগতিক শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে মানবিক মূল্যবোধ ও বিশ্বজনীন কল্যাণের এক শাশ্বত দর্শনে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনে ধর্মের ধারণাটি সবচেয়ে জটিল ও বাস্তবসম্মত রূপ পেয়েছে *মহাভারত*-এ। এই মহাকাব্যকে বলা হয় 'পঞ্চম বেদ', কারণ এটি কেবল একটি যুদ্ধের কাহিনী নয়, বরং এটি হল ধর্মের এক বিশাল পরীক্ষাগার। *মহাভারত*-এ ধর্ম কোনো সরলরৈখিক নিয়মাবলী নয়, বরং এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং পরিস্থিতি-নির্ভর। কিন্তু এই *'সর্বভূতহিতে'* রত থাকা বা *'লোকসংগ্রহ'* করা সর্বদা সহজলভ্য নয়। বাস্তব জীবনে সঠিক ও বেঠিকের সীমারেখা প্রায়শই অস্পষ্ট হয়ে যায়। *মহাভারত* তাই আমাদের বিভিন্ন প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে—*'ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ'*[10], অর্থাৎ ধর্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুর্জ্ঞেয়। বস্তুত, গতানুগতিক

---

[7] *"সঃ যঃ এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভুয় এব মা ভগবান বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।।"*—ছান্দোগ্য উপনিষদ-৬.৮.৭

[8] *"संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।।" - श्रीमद्भगवद्गीता-* १२.४

"लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः। छिन्नद्वैधाः यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः।।" - श्रीमद्भगवद्गीता- ५.२५

[9] *"सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्।।" - श्रीमद्भगवद्गीता-* ३.२५

[10] *"तस्मात्सद्भिर्न वक्तव्यं कस्यचित्किंचिद्यतः । सूक्ष्मा गतिर्हि धर्मस्य दुर्ज्ञेया ह्यकृतात्मभिः॥"—महाभारत-* १३/१०/६९

"चिन्तयानः स धर्मस्य सूक्ष्मां गतिमथाब्रवीत् । श्रद्दधानेन भाव्यं वै गच्छामि मिथिलामहम् ॥"—महाभारत- ३/१९८/२

নিয়ম দিয়ে ধর্মকে বিচার করা যায় না; পরিস্থিতির বিচারে বৃহত্তর কল্যাণ বা *'লোকসংগ্রহ'*-এর উদ্দেশ্যেই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারিত হয়। এখানে দেখানো হয়েছে যে, যখন প্রথাগত নিয়ম বা 'শাস্ত্র' মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে ব্যর্থ হয়, তখন কীভাবে বিবেক ও মানবতার ভিত্তিতে ধর্মের বিচার করতে হয়।

মহাভারত-এর পরতে পরতে এমনই 'ধর্মসংকট'-এর চিত্র ফুটে উঠেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের বিষাদ থেকে শুরু করে দ্যুতসভায় দ্রৌপদীর প্রশ্ন—সবকিছুই ধর্মের একেকটি গভীর স্তরকে উন্মোচন করে। বিশেষত, বনপর্বে '*যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদ*'-এ ধর্মের অতি গুরুত্বপূর্ণ রূপটি বেরিয়ে আসে। সেখানে যুধিষ্ঠির যক্ষকে জানান যে, "*আনৃশংস্য পরো ধর্মঃ*"[11] অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধর্ম হল আনৃশংসতা বা করুণা। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার সবচেয়ে কার্যকর নীতি হল দয়া ও অহিংসা। এটা মনে করা হয় যে, যে রাজা দয়া জানেন না, তিনি ন্যায়বিচার করতে পারেন না; আবার যে ব্যক্তি করুণা জানেন না, তিনি ধর্ম পালন করতে পারেন না। আর যে অন্যকে কষ্ট দেয়, তার জীবন কখনো পুণ্যময় হয় না।

এই প্রসঙ্গে নারায়ণ শর্মার রচিত *হিতোপদেশ*-এর সেই উচ্চ আদর্শের কথা উল্লেখ করা যায়— *"আত্মবৎ সর্বভূতেষু"*[12], অর্থাৎ সব জীবকে নিজের মতো করে দেখা। যখন আমরা মানুষের সেবা করি বা তার প্রতি মানবিক আচরণ করি তখন আমরা আসলে কোন বাইরের কাজ করছিনা বরং নিজেরই একটি অংশকে সেবা করছি। এই *"আত্মবৎ সর্বভূতেষু"* বোধটিই হল ধর্মের সর্বোচ্চ স্তর। এখানে ধর্ম ও মানবতা কোন পৃথক অস্তিত্ব নয়, মানবতাই এখানে ব্রহ্ম সাধনা।

"*আনৃশংস্য পরো ধর্মঃ*" তাই কেবল নৈতিক নয়, এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। কারণ, ধর্মের মূল উদ্দেশ্যই হল চিত্তকে বিশুদ্ধ করা, অহংকে দূর করা এবং মানবসত্তাকে তার নিজস্ব উজ্জ্বল, শান্ত, চৈতন্যময় রূপে প্রকাশ করা। যদি ধর্ম মনকে কঠোর করে তোলে, যদি তা বিভেদ সৃষ্টি করে, কিংবা যদি তা রাগ বা হিংসা জন্মায়—তবে সেই ধর্ম; ধর্ম নয়, বরং আবরণমাত্র। এখানে ধর্মকে আচার-সর্বস্বতা থেকে বের করে এনে মানবিক আচরণের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়েছে। তাই বলা যায়, ধর্ম যদি একটি প্রদীপ হয় তাহলে মানবতা হল তার শিখা। শিখা হীন প্রদীপের যেমন কোন স্বার্থকতা নেই তেমনই মানবতাহীন ধর্মেরও কোন আলোকবর্তীকা নেই। তাই ধর্ম ও মানবতা কোন পৃথক কক্ষপথ নয় বরং একই লক্ষ্যস্থলের দুটি নাম মাত্র।

মহাভারত-এর শান্তিপর্বে আলোচিত *'আপদ্ধর্ম'* বা সংকটকালীন নীতির ধারণাটি প্রমাণ করে যে, এই মহাকাব্যের নীতিবোধ কোনো জড় বা অনড় বস্তু নয়। চরম অরাজকতা বা প্রাণসংশয়ের মুহূর্তে জীবনের রক্ষা এবং সমাজের স্থায়িত্বই হল পরম ধর্ম। তাই চরম সংকটে যখন অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, তখন শাস্ত্রীয় নিয়ম গৌণ হয়ে যায়। অর্থাৎ, ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নয়—এই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি *মহাভারত*-এ প্রবল। ধর্ম মানুষের মঙ্গলের জন্যই সৃষ্ট, মানুষ ধর্মের যূপকাষ্ঠে বলিদানের জন্য নয়। আবার, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*-য় শ্রীকৃষ্ণ ধর্মকে 'স্বধর্ম' বা নিজের কর্তব্য পালনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।[১৩] তিনি বুঝিয়েছেন যে, ফলাফলের

"বেথ ত্বং তাত! ধর্ম্মাণাং গতিং সূক্ষ্মাং যুধিষ্ঠির!। বিনীতোহসি মহাপ্রাজ্ঞ! বৃদ্ধানাং পর্য্যপাসিতা।।" মহাভারত –২/৭০/৪ সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস (সম্পাদনা ও অনুবাদ), (১৪০০), *মহাভারত,* সভাপর্ব পৃষ্ঠা-৫৮৩ ।

[11] "*कश्च धर्मः परो लोके कश्च धर्मः सदाफलः। किं नियम्य न शोचन्ति कैश्च सन्धिर्न जीर्यते ॥"—महाभारत*-३/३१३/७५
"*आनृशंस्यं परो धर्मस्त्रयीधर्मः सदाफलः। मनो यम्य न शोचन्ति सन्धिः सद्भिर्न जीर्यते ॥"—महाभारत*-३/३१३/७६

[12] *"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।।"*— ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা.), *হিতোপদেশঃ* (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮), সন্ধিঃ —১৩৪ নং শ্লোক, পৃষ্ঠা-৮৯।

[13] *"श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः प रधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।" - श्रीमद्भगवद्गीता*-३.३५

আশা না করে নিজের স্বভাব ও অবস্থান অনুযায়ী কর্তব্য পালন করাই হল পরম ধর্ম। সুতরাং, মহাভারতের প্রেক্ষাপটে ধর্ম হল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যা পরিস্থিতি, ন্যায়বিচার এবং বৃহত্তর কল্যাণের (লোকসংগ্রহ) ওপর ভিত্তি করে প্রতিনিয়ত নিজেকে পুনর্গঠন করে।

অন্যদিকে, উপনিষদের ভূমিকা হল ধর্মের এই ব্যবহারিক দিকটিকে একটি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো। বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশে ধর্ম ছিল মূলত যজ্ঞকেন্দ্রিক এবং বাহ্যিক আচার-সর্বস্ব। উপনিষদ সেই বাহ্যিক আড়ম্বর থেকে ধর্মকে মানুষের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করায়। উপনিষদের ঋষিরা ঘোষণা করলেন যে, যজ্ঞের আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার চেয়ে নিজের ভেতরের লোভ, মোহ ও অজ্ঞানতাকে জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি দেওয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। *বৃহদারণ্যক* উপনিষদে ধর্মকে 'সত্য'-এর সমার্থক হিসেবে দেখা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যা ধর্ম, তাই সত্য এবং যা সত্য, তাই ধর্ম।[১৪] উপনিষদ শিখিয়েছে যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি জীবের মধ্যে একই 'আত্মা' বা 'ব্রহ্ম' বিরাজমান। এই অদ্বৈতবাদই হল উপনিষদীয় ধর্মের নৈতিক ভিত্তি।[১৫] আমি যদি অন্যকে আঘাত করি, তবে আমি আসলে নিজেকেই আঘাত করছি— এই বোধ থেকেই অহিংসা, দয়া এবং প্রেমের উৎপত্তি।

কঠোপনিষদ-এ ধর্মকে *'প্রেয়'* (যা আপাতমধুর বা প্রিয়) এবং *'শ্রেয়'* (যা কল্যাণকর)-এর মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৬] সাধারণ মানুষ প্রেয় বা ভোগের পথ বেছে নেয়, কিন্তু ধীমান ব্যক্তি বেছে নেন শ্রেয় বা ত্যাগের পথ। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*-এ গুরুর উপদেশে শিষ্যকে বলা হচ্ছে, *"সত্যং বদ, ধর্মং চর"*[১৭]— সত্য বলো, ধর্ম আচরণ করো। এখানে ধর্ম কোনো অলৌকিক বিশ্বাস নয়, বরং একটি সুশৃঙ্খল ও সত্যনিষ্ঠ জীবনযাপন পদ্ধতি। সুতরাং বলা যায়, মহাভারত যেখানে জীবনের জটিল পরিস্থিতিতে ধর্মের প্রয়োগ ও দ্বন্দ্বগুলো তুলে ধরেছে, উপনিষদ সেখানে ধর্মের তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি রচনা করেছে— যা মানুষকে আচারের জগত থেকে চেতনার জগতে উন্নীত করে। এই দুইয়ের সমন্বয়েই ভারতীয় দর্শনে ধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন হয়ে উঠেছে।

ধর্ম যদি মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখতে না শেখায় তবে তা মৃত ধর্মের বোঝা মাত্র। ভারতীয় ঐতিহ্যের দীর্ঘ পথ চলায় বার বার এই সত্যই উঠে এসেছে। যেখানে ধর্ম বড় হয়েছে সেখানে মানবতা জয়ী হয়েছে। আর যেখানে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে সেখানে ধর্ম কেবল নাম সর্বস্ব অন্ধ-সংস্কারে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় ঐতিহ্যে ধর্মের গগনচুম্বী আদর্শ আর মানবতার গভীর মমতা একই মোহনায় মিলিত হয়েছে। মানুষকে অবজ্ঞা করে কোন দেবালয়ে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ধর্ম যদি হয় আকাশ তবে মানবতা হল সেই মাটি;

---

14 *"যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্ধর্মং বদতীতি ধর্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি।।"— বৃহদারণ্যক উপনিষদ-* ১.৪.১৪

15 *"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"— মাণ্ডুক্য উপনিষদ-* ২

"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি । সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ।।" — ঈশ উপনিষদ- ৬

"যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ । তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।।"— ঈশ উপনিষদ- ৭

16 *"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত- স্তৌ সংপরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে।।" কঠোপনিষদ-* ১.২.২

17 *"বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবসিনমনুশাস্তি । সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ।........... ।।" তৈত্তিরীয় উপনিষদ—* ১/১১/১

আকাশ থেকে আর্শীবাদের বৃষ্টি যখন ঝড়ে পরে, তখনই জীবনের জয়গান গীত হয়। সুতরাং মানবিকতা কোন শব্দ নয়; এটি হল ভারতীয় ঐতিহ্যের সেই প্রদীপ্ত শিখা যা অন্ধকারেও মানুষকে পথ দেখয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভারতীয় ঐতিহ্যে মানবতা কোনো পাশ্চাত্যের আহরিত দর্শন নয়; বরং ভারতীয় সাংস্কৃতির দার্শনিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত এক চিরন্তন বোধ। বৈদিক ঋত-ধারণা থেকে উপনিষদের অদ্বৈত-দৃষ্টি, বুদ্ধের করুণাবাদ থেকে মহাভারতের ধর্মসংকট এবং আধুনিক মনীষীদের নেতৃত্বাধীন বৌদ্ধিক-আধ্যাত্মিক জাগরণ— এই ধারাবাহিক পথপরিক্রমায় দেখা যায় যে, ভারতীয় দর্শনে মানুষ কখনো প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কোনো পৃথক সত্তা নয়; বরং এক বৃহত্তর মহাজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এই মানবতাবাদের মূলে রয়েছে সেই গভীর উপলব্ধি— মানবজীবনের মূল্য নিহিত তার বুদ্ধি, আত্মচেতনা, নৈতিকতা ও করুণায়; জন্ম বা বিধির দেওয়া পরিচয়ে নয়। তাই এখানে মানবতাবাদ মানে কেবল মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নয়, বরং সকল জীবের অন্তর্গত সত্তাকে সম্মান করা, সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ এবং বৃহত্তর কল্যাণে আত্মসমর্পণ। এই জন্যই ভারতীয় মানবতাবাদ একইসঙ্গে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক, ব্যক্তিমানস ও বিশ্ববোধের সমন্বয়— যেখানে 'ধর্ম' হয়ে ওঠে মানবতারই শাশ্বত নাম।

আধুনিক বিশ্বে যখন ধর্ম সংকীর্ণ পরিচয়ে বিভক্ত হয়, সভ্যতা বিভাজনের দেওয়ালে আটকায় এবং ব্যক্তি স্বার্থ মানববোধকে গ্রাস করতে চায়, তখন ভারতীয় ঐতিহ্যের এই মানবতাবাদ আমাদের উৎসাহ দেয় আবারও মানবতার দিকে ফিরে যেতে—যেখানে ধর্ম মানে *'লোকসংগ্রহ'*[১৮], সমাজ মানে *'বসুধৈব কুটুম্বকম্'*[১৯] এবং নৈতিকতার পরম আদর্শ হল *'সর্বভূতহিতে রতাঃ'*[২০]— সকল জীবের মঙ্গলে নিবেদিত থাকা।

অতএব, ভারতীয় মানবতাবাদ আমাদের শেখায়— মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব তার প্রজ্ঞা বা শক্তিতে নয়, বরং তার দয়া, তার সত্যনিষ্ঠতা এবং বৃহত্তর জীবনের প্রতি তার দায়বোধে। এই দায়বোধই ভারতীয় চিন্তাকে করেছে মহাজাগতিক, আধ্যাত্মিক ও গভীরভাবে মানবিক— যা কেবল অতীতের ঐতিহ্য নয়, বরং ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতারও অন্যতম পথদ্রষ্টা।

গ্রন্থপঞ্জি:

বাংলা গ্রন্থ:

১. গম্ভীরানন্দ, স্বামী, সম্পা. উপনিষদ গ্রন্থাবলী (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬০।
২. ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ। ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি। পণ্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
৩. চক্রবর্ত্তী, বসুধা। মানবতাবাদ। কলকাতা: দ্বীপায়ন প্রকাশনী, ১৩৬৭।
৪. চক্রবর্তী, বিষ্ণুপদ। মহাভারত। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২।

---

[18] *"सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्।।" - श्रीमद्भगवद्गीता-* ३.२५

[19] *"অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।"– হিতোপদেশ,* মিত্রলাভ, ১.১৩

[20] *"संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।।" - श्रीमद्भगवद्गीता-* १२.४

"लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः। छिन्नद्वैधाः यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः।।" - श्रीमद्भगवद्गीता- ५.२५

৫. চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ সাংখ্যতীর্থ, রচনা ও সম্পা. রামায়ণ-মহাভারত অবলম্বনে: মহাকাব্য নিবন্ধাবলী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩।

৬. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, সম্পা. হিতোপদেশ। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮।

৭. চক্রবর্তী, নীরদবরণ। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মানুষের ধর্ম। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৩৩।

৯. ত্রিপাঠী, শ্রীদীনানাথ, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা. মানমেয়োদয় (নারায়ণভট্ট), প্রথম খণ্ড। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৯০।

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, সম্পা. মনুসংহিতা (কুল্লুকভট্টটীকা সহিত)। ২য় সংস্করণ, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি, [তারিখ অনুপস্থিত]।

১২. বসু, রাজশেখর, অনূদিত। মহাভারত (সারানুবাদ)। কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।

১৩. বিবেকানন্দ, স্বামী। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (সমগ্র খণ্ড)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।

১৪. ব্রহ্ম, নলিনীকান্ত, সম্পা. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মধুসূদন সরস্বতী টীকা সহিত)। পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ২০০৬।

১৫. ভট্টাচার্য, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, সম্পা. ও অনু. মহাভারত (বনপর্ব: খণ্ড ৬-১১)। কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

১৬. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা. বৈশেষিকসূত্র (মহর্ষি কণাদ)। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪।

১৭. মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ। নীতি, যুক্তি ও ধর্ম: কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ। ৭ম মুদ্রণ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

---. ভারতীয় মহাকাব্যে ধর্ম, নীতি ও যুক্তি। কলকাতা: অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০২৪।

১৮. মুখোপাধ্যায়, গুরুশঙ্কর, অনু. লৌগাক্ষিভাস্করকৃত অর্থসংগ্রহ: ব্যাখ্যামূলক বাংলা অনুবাদ। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

১৯. রায়, প্রতাপচন্দ্র, অনু. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলকাতা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি।

২০. শাস্ত্রী, পণ্ডিত রামচন্দ্র, সম্পা. মহাভারতম্ (১ম - ৭ম খণ্ড) নীলকণ্ঠী ভাষ্য সহ। ২য় সংস্করণ, পুনে: চিত্রশালা প্রেস, ১৯৭৯।

২১. সপ্ততীর্থ, ভূতনাথ, বঙ্গানুবাদ. মীমাংসাসূত্র (জৈমিনি)। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬।

২২. সান্যাল, জগদীশ্বর। ভারতীয় দর্শনের ইতিবৃত্ত। কলকাতা: শিলালিপি,।

২৩. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, অনু. বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা: সাহিত্য তীর্থ, ২০১৪।

২৪. সেন, অতুলচন্দ্র, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ এবং মহেশচন্দ্র ঘোষ, অনু. ও সম্পা. উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ)। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০২১।

২৫. সেন, অমর্ত্য। তর্কপ্রিয় ভারতীয়। অনু. সুতপা সেনগুপ্ত, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

ইংরেজি গ্রন্থ:

1. Dasgupta, Surendranath. A History of Indian Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Hiriyanna, M. Outlines of Indian Philosophy. London: George Allen & Unwin Ltd, 1932.
3. Iyer, K. Balasubramania. Yaksha Prasna. Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1989.
4. Radhakrishnan, S. Indian Philosophy (Vol. I & II). New Delhi: Oxford University Press, 2008.
5. Rajagopalachari, C. Mahabharata. Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan, 2024.
6. Sivayogananda, Swami. Yaksha Prashna: Dialogue between Yudhishthira and Lord of Dharma. Mumbai: Chinmaya Prakasana, 2024.
7. Srinivasan, A. V. Yaksha Prashna: A Fable from the Mahabharata. New Delhi: Vision Books Pvt. Ltd., 2014.
8. Tarkatirtha, Ramendra Chandra. Mahabharata: Laksa-sloka-Rahasyam. Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1974.